বিয়ে থা

সজল চৌধুরী

ভূমিপ্রকাশ

উৎসর্গ

বাবা আবদুর রহমান মারা গেছেন ২০১১ সালে, মা বিউটি বেগম মারা যান ২০১৩ সালে। বড়ো ভাই নাসির উদ্দিন মারা যান ২০২৩ সালে।

মা-বাবা বেঁচে থাকতে প্রেমে পড়েছিলেন এলাকার প্রভাবশালী চেয়ারম্যানের মেয়ের। চেয়ারম্যান তাকে পিটিয়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল অন্য কারও সাথে। সেই থেকে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।

এরপর পরিবার বেঁচে থাকতে সুস্থ-অসুস্থতার মধ্য দিয়ে জীবন চলে গেলেও বড়ো ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। হয়ে পড়ে পুরোপুরি ভারসাম্যহীন এক মানুষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই ছিল তার সবকিছু ভুলে থাকার জায়গা। খাওয়া আর টাকা ছাড়া আর কোনোকিছুরই চাহিদা ছিল না। সেদিনও ছিল না।

ঘটনার দিন রাত ৮টায় খাবারের আশাতেই সে এসেছিল হলে। তারপর যা হলো তা আর কারও জীবনেই না ঘটুক।

প্রিয় তোফাজ্জল, ওপারে ভালো থেকো।

তোমার জন্য কিছু করতে না পারার এক বুক হাহাকার বুকের খাঁচায় আজীবন বন্দি রইল।

মব জাস্টিস বন্ধ হোক।

ভূমিকা

যখন আমি "ভরকেন্দ্র" গল্পটা লিখি তখন ভেবেছিলাম আমি গল্পের নতুন কোনো ধারা তৈরি করে ফেলেছি!

বেশ পরে আশরাফুল সুমন ভাইয়ের মাধ্যমে জানলাম গল্পের এই ধারাটার নাম "মেটাফিকশন"– যেখানে গল্পের চরিত্ররা জানে যে তারা একটা গল্পের চরিত্র। তাদের আলাদা চেতনা থাকে। পাঠকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে। প্রয়োজনে তারা গল্পের লেখকের সাথে যোগাযোগ, গালাগালি– এমনকি লেখককে মেরে ফেলার মতোও কাজ করতে পারে! এটাকে বলা যায়, আয়না ধরে দেখা– যেখানে কাহিনি নিজেকেই একটা গল্প হিসেবে উপস্থাপন করে।

সরল ভাবে বলতে গেলে, মেটাফিকশন হলো এমন গল্প যা নিজের গল্প হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সচেতন এবং সেই সচেতনতাকে গল্পের অংশ হিসেবে ব্যবহার করে।

মেটাফিকশনের কিছু চমৎকার ব্যাপার আছে। যেমন, প্রচলিত কথাসাহিত্যের কাঠামো ভেঙে ফেলে, বাস্তবতার প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।

অজ্ঞতা কিংবা অনিচ্ছা, যে কারণেই হোক না কেন, এই ধারায় সাহিত্যিকদের খুব একটা ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় না। তাই একসময় ইচ্ছা ছিল, প্রতি বছর একটা করে গল্প হলেও মেটাফিকশন লিখব। কিন্তু ৩য় বছরে এসে সেই ২০১৬-তে যে থেমে গেলাম, আর গতি হলো না। শেষমেশ এই তিনখানা গল্পকে পুঁজি করে কিছু একটা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করলাম। হয়তো কেউ এই তিনখানা গল্পকে ভাগাড়ে ফেলে গোবরে পদ্মফুল ফোটাবে। সেই অপেক্ষায় রইলাম।

আপনার গল্প যাত্রা শুভ হোক।

সজল চৌধুরী
বাংলাদেশ

এই কাহিনিটা
ট্র্যাজিক

একটা কাহিনি লিখছি যেটা হবে মারাত্মকভাবে বিয়োগান্তক মানে ট্র্যাজিক। পাঠকরা পড়বে আর নোনাজলে বই ভেজাবে। খেয়াল করে দেখলাম, পাঠকরা প্রেমের গল্পের ট্র্যাজেডি খুব ভালোবাসে। শিরি-ফরহাদ, লাইলি-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট আরও কত রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিই তার প্রমাণ। তাই আমার কাহিনিটা রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি।

কাহিনির নায়ক অক্ষর। আলাভোলা টাইপ চরিত্র। চাকরির সন্ধানে স্যান্ডেলের বারোটা বাজিয়েছে। ছেলেটা পড়াশোনায় ভালোই। কিন্তু ট্র্যাজেডি আনতেই তাকে আর চাকরি পেতে দেই না। ইন্টার্ভিউতে পাশ করলেও বুদ্ধি করে বাদ দিয়ে দেই। আসলে উপন্যাসে চাকরি পাওয়া ছেলেদের দিয়ে ট্র্যাজেডি হয় না।

নায়িকার নাম সাবিহা। স্বাভাবিকভাবেই সে বেশ অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সুন্দরী মেয়ে। পাঠকরা চায়ই ধনী পরিবারের ধনি মেয়েটা দরিদ্র ছেলের প্রেমে পড়ুক। বাংলা চলচ্চিত্র গড়েও উঠেছে এই ছকে। কারণ এতে

একটা ড্রামাটিক আবহ পাওয়া যায়। ট্র্যাজেডিতে এটার দরকার আছে।

অবশ্য তারা প্রথমে একে-অপরের প্রেমে পড়ছিল না। বহুবার দেখা করিয়ে, নানান ফন্দিফিকির করে প্রেমে ফেলাতে হয়েছে। দেবদাসের প্লট মাথায় রেখে ঠিক করেছি কাহিনির শেষে ছেলেটাকে মেরে ফেলব। তাহলে বেশ ভালো একটা ট্র্যাজেডি হবে। যাই হোক, কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম, কাহিনি শুরু করি। আজকে তাদের দেখা করার কথা– দেখি তারা কী বলে।

কাঠের বেঞ্চে অক্ষর মাথা মন খারাপ করে বসে আছে। সাবিহা তার পাশে এসে বসতে বসতে বলল, 'ইন্টার্ভিউ কেমন হলো?'

'ভালো। তবে জানোই তো চাকরিটা আমার হবে না।' কণ্ঠে দুখীভাব।

'কেন হবে না? অবশ্যই হবে। তুমি অত ভেবো নাতো।' সাহস দেয় সাবিহা।

'সাবিহা, তুমি তো জানোই এই গল্পের লেখক আমাকে চাকরি পেতে দেয় না। আমাকে গল্পের শেষে মেরেও ফেলবে। তুমি কেন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ না? এই কাহিনিটা ট্র্যাজিক।' আর্তনাদ করে ওঠে সে।

ভরাকেন্দ্র

কোনো কিছুর ভরকেন্দ্র বলতে সেই বিন্দুকে বোঝায় যে বিন্দুতে সমগ্র ভর কেন্দ্রীভূত বলে ধরে নেওয়া হয় এবং যেখানে লব্ধি বল ক্রিয়া করে।

দুঃখিত। আমি আসলে বিজ্ঞানের কোনো সমস্যা নিয়ে নয় বরং তার চেয়েও জটিল এক সমস্যার সাথে পরিচিত করাতে যাচ্ছি।

একটা গল্প লিখছি। কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। বিষয়টা খুলেই বলি। আমি একটা রোম্যান্টিক গল্প লিখছি। যেন তেন রোম্যান্টিক গল্প নয়, নিখাদ প্রেমের গল্প। লিখতে গিয়ে ভাবলাম, সবাই তো একভুজ, দ্বিভুজ, ত্রিভুজ প্রেমের গল্প লেখে, আমি নাহয় পঞ্চভুজ প্রেমের গল্প লিখি। চারজন ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে। কত ভাগ্যবতী নায়িকা, তাই না?

সমস্যা হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, কোন ছেলেকে ভাগ্যবান বানাব, মানে কার সাথে মিল দেখাব। আপনাদের সাহায্য চাই। তাই আপনাদের

আগে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে।

মোবারক হোসেন, আমার গল্পের নায়িকা অদ্বিতীর চাচাতো ভাই। পিঠাপিঠি। বড়ো হয়েছে একই সাথে। পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়, বিস্তর সম্পত্তি থাকায় গ্রামেই রয়ে গিয়েছে। অদ্বিতীকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু কখনোই মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দিলান আহমেদ, অদ্বিতীর কলেজ বন্ধু। একসাথেই কলেজে পড়েছে। ভার্সিটি আলাদা। কৈশোরের প্রথম ভালোবাসাকে আজও সযতনেই আগলে রেখেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেকবারই বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বলা আর হয়নি। ভার্সিটি আলাদা হলেও এখনও ভালো যোগাযোগ রয়েছে।

ইখলাস রহমান, ভার্সিটির বন্ধু। একই ডিপার্টমেন্টে একই সাথে পড়ছে। এমএসসিতেও একই সাথে। প্রথম দেখাতেই প্রেম পড়েছে, এখনো সেই প্রেমেই পরে আছে। অবশ্য একবার প্রপোস করেছে, কিন্তু উত্তর না হওয়া সত্ত্বেও এখনো হাল ছাড়ে নাই।

আর সবশেষে, উপল চৌধুরী, অদ্বিতীর ফেসবুক বন্ধু। তিনবার দেখাও হয়েছে। লেখক মানুষ, বিধায় প্রায়শই অদ্বিতীকে কথার জালে ফাঁসাতে ফাঁসাতে নিজেই তার প্রেমে ফেঁসে গিয়েছেন। যদিও প্রস্তাব দেননি, তবুও সবুজ সংকেতের আশা ছাড়েননি।

একজন গ্রামে অপেক্ষা করে, একজন অন্য ভার্সিটিতে, আরেকজন একই ভার্সিটিতে, অন্যজন অনলাইনে অপেক্ষা করেন। আর তাদের ভরকেন্দ্র অদ্বিতী সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছে। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, কার সাথে মিল দেব?

আচ্ছা, এক কাজ করি, এই পাঁচজনকে একসাথে করি, তারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে সেটাই পরিণতি,

বিয়ে থা

অবশেষে আমি আমার বউকে নিয়ে ভাগলাম।

এইটা লেখক কী লিখল? আজব তো। আমি কবে আমার বউকে নিয়ে ভাগলাম। আমার বিয়েই বা হলো কবে? আরে আমি তো শুধু আমার বান্ধবীকে বিয়ের আসর থেকে পালাতে সাহায্য করছি। আর লেখক পাঠক ধরতে ভুয়া কথা লিখে দিলো!?

আর গল্পটা এখান থেকেও শুরু হয়নি। পালানো নিয়ে কাহিনি আরও পরে আসবে। গল্পটা শুরু হয়েছে এখান থেকে,

যে আসনে বসি আছি, সেটাকে বলা যায় হাগাসন। ইংরেজি "হাগ"+বাংলা "আসন" নয়। হাগা+আসন। "হাগা" আঞ্চলিক শব্দ; মানে মল ত্যাগ করা। এই আসনে বসতে হলে ব্যাঙের মতো পা ছড়িয়ে নিজের পাছাকে পৃথিবীর অভিকর্ষের সাথে বিয়ে দিতে হবে।

তারা কয়েক পাকে বাঁধা পড়বে হাগুর মাধ্যমে। পুপ ইমোজির মতো একখানি হাগু হাগাই আপনার একনিষ্ঠ লক্ষ্য। খেয়াল রাখতে হবে, মোবাইল ব্যালেন্স লিমিটের মতো এই হাগুকর্মেরও একটা লিমিট আছে। যখনই এর শীর্ষ আপনাকে ছুঁতে চাইবে তখনই আপনাকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে। নয়তো হাগায় হাগাহাগি মানে মাখামাখি হয়ে যাবেন।

ওসব নিগূঢ় আলাপ থাক। যে কারণে হাগাসনে আছি সেটা বলি। লোকে বলে আমি অনেক বকবক করি। এক চাল দুচাল করে বাচালের মতো কথার বস্তা ভরিয়ে ফেলি। কিন্তু জানি, আমি মোটেও বাচাল নই। এই যে কত দ্রুত মূল বিষয়ে ফিরে এলাম। এরপরেও কি প্রমাণ চাই দুর্মুখোদের?

তো হাগাসনে বসে আছি কেন—সেটাই হচ্ছে মূল জিজ্ঞাসা। উত্তর দেবার আগে বলি, আমি মোটেও হাগতে হাগাসনে বসে নেই। তারচেয়েও বড়ো কথা, হাগাসনে আছি ক্যাম্পাসের এক কোনায়। যার মানে এটা হাগার মতো কোনো জায়গা নয়। তার ওপর আমার সামনে গাছের চারপাশে দেওয়া গোলাকার বেদিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে একজন রমণী। তার সামনে অবশ্যই আমি হাগতে বসবো না। সবমিলিয়ে আশা করি, আপনাদের পরিষ্কার করতে পেরেছি যে, আমি মোটেও হাগার জন্য হাগাসনে নেই।